B.A 6th Semester

Sub- (Major) BENGALI

Paper - 6.5

হারানো দিন হারানো মানুষ

১) প্রশ্ন : সুজিৎ চৌধুরীর 'হারানো দিন হারানো মানুষ' গ্রন্থ অবলম্বনে 'দিদিমণি' চরিত্রটি তোমার নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

উত্তর : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরীর (১৯৩৭-২০০৯) *হারানো দিন হারানো মানুষ* (প্রথম পর্ব) গ্রন্থটিকে সেই সময়ের বাস্তব সমাজ এবং জীবনের এক জীবন্ত ঐতিহাসিক দলিল বলা যায়। এই গ্রন্থে লেখকের স্মৃতির পট থেকে একের পর এক অগণিত মানুষ উঠে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে লেখকের 'দিদিমণি'ও একজন। লেখকের দৃষ্টিতে 'দিদিমণি' একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী তেজস্বিনী নারী ছিলেন।

গ্রন্থে দেখা যায়---- 'দিদিমণি' হলেন, লেখকের মায়ের মা--- অর্থাৎ দিদিমা। লেখক গ্রন্থে তাঁকে 'দিদিমণি' বলে উল্লেখ করেছেন। দিদিমণি ছিলেন নিষ্ঠাবতী বিধবা। পুজো-পার্বণ নিয়েই তাঁর দিন কাটত। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি একাদশীর ব্রত পালন করতেন। তিনি নিজে রান্না করে খেতেন এবং অত্যন্ত সংযমের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতেন। খাওয়া-পরা ইত্যাদি কোন কিছুর দিকে তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর নাতি-নাতনীদের তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁকে পুজো-পার্বণ করতে দেখলে তাঁরা (নাতি-নাতনীরা) প্রসাদের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। তিনি তাঁর নিরামীষ রান্নার সঙ্গে প্রতিদিন তাঁদের জন্য নানা ধরনের ভাজা-ভুজি তৈরি করতেন।

দিদিমণি তাঁর নাতি-নাতনীদের বিভিন্ন দেবদেবী পুরাণের গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন। তাঁরা ছোটবেলায় দিদিমণির কাছে অনেক গল্প শুনেছিলেন। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "দিদিমণির গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। তবে রূপকথা নয়, দেবদেবী পুরাণের গল্প। আমাদের ঘুমপাড়ানোর কাজে তিনি সেগুলি ব্যবহার করতেন। তাতে করে শৈশবে পুরাণের অজস্র গল্প

আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল।" কৃত্তিবাসী রামায়ণ শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। অক্ষরজ্ঞান হওয়ার পর পরই সুজিৎ চৌধুরীকে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করে শোনানোর কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দিদিমণির আশীর্বাদের স্পর্শে বালক সুজিৎ চৌধুরীর রামায়ণ এবং পুরাণ কাহিনি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। বালক সুজিৎ চৌধুরীর অনেক কিছু মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তিনি পরিবারের অন্যান্যদের সেগুলি শোনাতে পারতেন। তা দেখে দিদিমণি খুব খুশি হতেন। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "রামায়ণ এবং পুরাণ কাহিনীতে আমার সেই আগ্রহ দেখে দিদিমণি বলে বেড়াতেন যে তাঁর এই নাতি খুবই ধর্মপ্রবণ হবে।"

সুজিৎ চৌধুরীর **মাতা সুপ্রভা চৌধুরী** ছিলেন দিদিমণির ছোট মেয়ে। পিতৃহীন কন্যা বলে তিনি তাঁকে বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর ধারণা ছিল--- সংসার চালানো খুবই কঠিন কাজ, সুপ্রভা চৌধুরী পেরে উঠবেন না। তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়শই সুপ্রভা চৌধুরীর সঙ্গে থাকতেন। বাড়িতে আত্মীয় স্বজনদের অভাব দেখে তিনি নিজে চেষ্টা করে জামাতা বিধূভূষণ চৌধুরীর এক ভাগ্নেকে পড়াশুনা করানোর জন্যে পাইলগাঁও-এ নিজের কাছে নিয়ে আসেন। প্রায় অনাত্মীয় এই ভাগ্নেকে তিনি নিজের দৌহিত্রর থেকে বেশি ভালবাসতেন এবং ভরসা করতেন। যিনি পূর্ব থেকেই তাঁদের বাড়িতে থাকতেন। আত্ম-পর সবাইকে তিনি সমান ভালবাসতেন। পাইলগাঁও-এ তাঁদের বাড়ির পাশে স্কুলের একটি হোস্টেল ছিল। হোস্টেলের ছেলেদেরও তিনি খুব ভালবাসতেন। তাদের অসুখ বিসুখ হলে ওষধ-পথ্য যোগানোর ভার তিনি স্ব-ইচ্ছায় গ্রহণ করতেন।--- এইভাবে পর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

গোলকনাথ বলে একজন লোকের কথা লেখক সুজিৎ চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন। তাঁকে লেখক 'গোলকমামা' বলে ডাকতেন। এই গোলকমামা দিদিমণিকে 'মা' বলে ডাকতেন। গোলকমামা দিনমজুরের কাজ করতেন। যেদিন তাঁর কাজ জুটত না, সেদিন দিদিমণি তাঁকে খাইয়ে দিতেন। বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য চাল-সব্জীও সঙ্গে দিয়ে দিতেন। এছাড়াও আরো একজন ছিলেন যাঁকে দিদিমণি প্রায় প্রতিদিন খাওয়াতেন। তিনি হলেন, **হেডমাস্টার যতীন্দ্রমোহন চৌধুরীর** দ্বিতীয় ছেলে যশু। তাঁর মাথায় একটু গণ্ডগোল ছিল। বাড়ির পাশের স্কুলের ছেলেরাও টিফিনের সময় খিদে পেলে দিদিমণির কাছে টিফিন খেতে চলে আসত। দিদিমণি তাদের চিড়ে-মুড়ি খাওয়াতেন। তাঁর অসংখ্য পোষা কুকুর বেড়ালও ছিল। সেগুলিও তাঁর আদর-ভালবাসা-স্নেহ এবং খাবারের অংশীদার ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দিদিমিণি সে যুগের খুব নিষ্ঠাবতী একজন বিধবা মহিলা ছিলেন। তবে মুসলমানদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে হবে, এমন কোন রোগ তাঁর ছিল না। এই সম্পর্কে লেখক গ্রন্থে একটি ঘটনার কথা বলেছেন। --- **দিগিন দাশগুপ্ত** একবার তাঁদের বাড়িতে খেতে এসেছিলেন। পুলিশের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তিনি **মুসলমানের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিলেন**। একজন মুসলমান লোককে খাওয়ার ঘরে খেতে দিতে সুপ্রভা চৌধুরীর আপত্তি ছিল। কিন্তু তাতে দিদিমণির কোন আপত্তি ছিল না। তিনি বলেছেন, "কী হবে ঘরে খাওয়ালে, ওর বন্ধু যখন।" এই দিগিন দাশগুপ্ত পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট নেতা হয়েছিলেন। তিনি তো ছিলেন নকল মুসলমান, দিদিমণি আসল মুসলমানদের খাওয়াতে অথবা খাওয়ার পর বাসন তুলে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করতেন না। স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার আব্দুল সোভান সাহেবের ছেলে সামসুল দিদিমণির তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন দুপুরে তাঁদের বাড়িতে টিফিন খেতে আসত। দিদিমণি তাকে টিফিন খাওয়াতেন এবং তার বাসনগুলো নিজে তুলে নিয়ে যেতেন। --- -- সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখার এমন প্রবণতা সত্যি প্রশংসনীয়।

দিদিমণি ছিলেন একজন ব্যক্তিত্বময়ী তেজস্বিনী এবং দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী নারী। খুব সহজে কোন বিষয়ে তিনি হার মানতেন না। তাঁর ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি যখন দেখলেন, সেই মেয়ের স্বামী দু'দিন ঘরে থাকেন তো দশ দিন জেলে থাকেন। তাঁর মনে হয় এভাবে সংসার চলতে পারে না। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি সোজা চলে যান তখনকার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তিনি বুঝিয়ে বলেন, জামাই জেলে জেলে থাকলে তাঁদের সংসার ছারখার হয়ে যাবে। সরাসরি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে তিনি কোন ধরনের সংকোচ বোধ করেননি। সেই সময় এই বিষয়টা খুব সহজ ছিল না। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "গ্রামের মহিলা হলেও দিদিমণির ব্যক্তিত্ব ছিল, নইলে সরাসরি ব্রজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করতে সাহসই পেতেন না।" দিদিমণির অনুরোধে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর জামাতা বিধুভূষণ চৌধুরীকে তাঁদের (ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীদের) জমিদারীর অন্তর্গত নিজেদের স্কুলে (পাইলগাঁও-এর ব্রজনাথ হাইস্কুলে) শিক্ষকের চাকরি দিয়ে পাঠিয়ে দেন। তারপর থেকে দীর্ঘদিন তিনি সেখানেই ছিলেন। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "দিদিমণি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাবা পাইলগাঁও-এ ছিলেন। দিদিমণি মারা যাওয়ার পর অবশ্য আর অপেক্ষা করেননি, তিন মাসের মধ্যেই আবার সিলেট।" জামাই তাঁর মাতৃস্থানীয়া শাশুড়ি মায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে

তাঁর জীবিতকালে বাড়ি ছেড়ে যাননি। এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন দিদিমণি।

দিদিমণির ফুল ও ফলের বাগান করার শখও ছিল। বাড়ির মধ্যে কোন ধরনের নোংরা পরিবেশ তাঁর বিন্দুমাত্র পছন্দ ছিল না। পাইলগাঁও-এর বাড়ির উঠোন দেখাশোনা করে তিনি সারাক্ষণ ঝকঝকে রাখতেন। শেষ বয়সে তিনি তাঁর অনেকটা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন তাঁর ছোট ছেলে মানসের কাছে। সেখানেই তিনি শেষ নিঃ□াস ত্যাগ করেন। লেখক সুজিৎ চৌধুরী তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা-সম্মান আদর-ভালবাসা উজার করে দিয়ে তাঁর দিদিমণিকে গড়ে তুলেছেন।

.. ..

RITA DEY